অবরোহী

সনৎ বসু

আজও হল না।

বুকের গভীর থেকে উঠে আসা কয়েকটা শব্দ চাপা আর্তনাদ হয়ে অতীনকে আরেকবার নাড়িয়ে দিয়ে যায়।

দেওয়াল ঘড়িটা মিষ্টি শব্দে জানায় রাত দু'টো। বুকের তলা থেকে বালিশ সরিয়ে চিত হয়ে শোয় অতীন। শরীরটা স ম্পূর্ণ ছেড়ে শবাসনে থাকার মতো চোখ বুঁজে পড়ে থাকে। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার দহন অনুভূতির তন্ত্রীগুলোকে কুরে কুরে খায়।

সুনির্মলের কাছে তবে সত্যি সত্যিই হার মানতে হবে?

আজ নিয়ে পর পর দশ দিন। একটা গল্পের প্লট দানা বেঁধে উঠল না। নিদেন পক্ষে একটা ঘটনা। বা একটা দুটো সংল াপ।

এই কদিন অফিস ছুটির পর সোজা ফ্ল্যাটে চলে এসেছে অতীন। সন্ধ্যের পর কোনো কাজ রাখে নি। ঘরে ঢুকেই অন্যান্য দিনের মতো টিভি-র নব্ ঘুরিয়ে সোফায় বসে পড়েনি বা টেপ রেকর্ডারে অনুপ জালোটার ক্যাসেট জুড়ে ব্যালকনির অন্ধকারে গিয়ে বসে নি। মনে মনে নিজেকে তৈরি করেছে। স্পি আর নিলয় তার সঙ্গে গল্প করতে এলে ভুলিয়ে ভালিয়ে তাদের অদিতির কাছে পাঠিয়েছে।

বাথম থেকে স্নান সেরে সে সটান শুয়ে পড়েছে বিছানায়। প্রায় ঘন্টাখানেক নিঃসাড়ে পড়ে থেকেছে। অতীনের কথায় এট ানাকি তার মনের বিশ্রাম। যাতে রাত গভীরে লেখার সময় সজীব থাকে মনটা।

অদিতিও এই ক'দিন তাকে কোনোভাবে বিব্রত করে নি। যতটা সম্ভব লেখার সুযোগ করে দিয়েছে। হাতের কাছে টিফিন রেখে দরজা ভেজিয়ে পাশের ঘরে স্পি নিলয়কে পড়াতে বসিয়েছে। রাতে খাওয়ার সময় হলে ডাকতে বলেছে।

এরকম সুযোগ কজন লেখক পায়!

আজও যথারীতি টিফিন খাওয়ার পর বিছানায় আয়েস করে বসেছিল অতীন। বিছানার পাশেই হাফ - সেক্রেটারিয়েট টেবিল আর ফোমের গদিওয়ালা চেয়ার। কিন্তু আগেকার অভ্যাস মতো টেবিল চেয়ারের থেকে নরম বিছানাই তার লেখার প্রিয় জায়গা।

লিখতে বসে প্রথমেই একটা সুন্দর নাম মনে এসেছিল অতীনের। খুব রোম্যান্টিক নাম। স্বপ্ন সমুদ্র। একটা দুঃখী মেয়ের সুখ, স্বপ্ন আর রূঢ় বাস্তবের সংঘাতকে গল্পে রূপ দেওয়ার ইচ্ছে ছিল। পর পর ন'টা রাত নিষ্ফলা কেটেছে, মনের মধ্যে সৃষ্টি আকুলিবিকুলি। আভাস যখন একটা পাওয়া গেছে, গল্প নিশ্চয়ই লেখা হয়ে যাবে। পরম উৎসাহে খাতাটা সামনে টেনে ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল অতীন।

কিন্তু তারপর? সেই অনাদি অনন্ত প্রতীক্ষা। 'থিম'টা মাথায় থাকলেও কিছুতেই সাজানো যাচ্ছে না গল্পটা। কোথা থেকে কিভাবে শু করবে ভাবতে ভাবতেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল অতীন।

ঘুম যখন ভাঙল, দেখল টেবিলের ওপপর ঢাকা রাতের খাবার। অতীন নিজের মনেই হাসল, নির্দেশগুলো কি নিখুঁত ভ াবে মেনে চলেছে অদিতি।

গতকালও সে খাতা কলম পাশে রেখে চোখ বুঁজে শুয়েছিল। রাত দশটা নাগাদ খেতে বসবার জন্যে ডাকতে এসে তার মুখ ঝামটা খেয়েছিল অদিতি। আসলে অতীন তখন নতুন একটা গল্প সাজাবার চিন্তায় মগ্ন ছিল। অদিতির ডাকে ছকটা সেই যে গোলমাল হয়ে গেল, অনেক চেষ্টা করেও ঠিকঠাক গোছাতে পারল না অতীন।

তখনই নতুন নির্দেশ দিয়েছিল ঘুমিয়ে পড়লে তার খাবার যেন টেবিলের ওপর ঢেকে রাখা হয়। 'তথাস্তু' বলে গম্ভীর

মুখে চলে গিয়েছিল অদিতি।
অতীনের আশ্চর্য লাগে আজ দশ দিন তারা এক বিছানায় শোয় নি। এমনকি হাসি ঠাট্টা করে নি। শুধু স্পি-নিলয়ের সঙ্গে টুকটাক দু একটা কথা ছাড়া বাড়িতে অতীনের মাথা জুড়ে থেকেছে গল্পের চিন্তা। যতই দিন গেছে ততই সে মরিয়া হয়ে উঠেছে। সুনির্মলকে সে কিছুতেই জয়ের শিরোপা কেড়ে নিতে দেবে না।
ছোট্ট সংসার বলে অনেক ক্ষেত্রেই সে আর অদিতি নিজেদের মধ্যে একটা অলিখিত কর্ম - বিভাজন করে নিয়েছিল। নিতান্ত অসুবিধে না হলে সেটা মেনে চলত দুজনেই।
রাতে শোওয়ার আগে অতীনের কাজ বেড কভার তুলে, বিছানার চাদর ঝেড়ে, মাথার বালিশ দুটো জায়গা মতো রেখে, খাটের স্ট্যান্ডের চার কোণে মশারির দড়ি লাগানো। তারপর নেমে গিয়ে বড় দরজার খিল ছিটকনি লাগিয়ে ভেতর থেকে তালা আটকানো। এই তালা দেওয়ার ব্যাপারটা দু'মাস আগেও ছিল না। পাশের ফ্ল্যাটে একটা মস্ত চুরির ঘটনা ঘটায় অদিতির পীড়াপীড়িতে ব্যবস্থাকরতে হয়েছে।
সব শেষে বাইরের সুইচগুলো অফ্ করে, পা মুছে বিছানায় উঠে সটান শুয়ে পড়া।
অদিতি ততক্ষণে খাওয়ার বাসন কলঘরে ডাঁই করে, ডাইনিং টেবিল মুছে, কিচেনের জানলা বন্ধ করে, ফিল্টার থেকে জগে জল ভরে বাথমে ঢোকে।
ঘরে এসেই 'পলিত্রল'-এর কাপ আর জলের গ্লাস হাতে মশারি কাছে গিয়ে দাঁড়ায় অদিতি। শরীর কোমর পর্যন্ত তুলে কাত হয়ে 'অ্যান্টাসিড' খায় অতীন।
অদিতি এরপর আয়না চিনি নিয়ে মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে। এক মনে চুলের জট ছাড়ায়। ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে এগারোটা হলে উঠে দাঁড়ায়। জগ থেকে ঢক ঢক করে বেশ খানিকটা জল খেয়ে আলো নিভিয়ে বিছানায় উঠে পড়ে।
এই দশটা দিন সংসারের অনেক নিয়মই পালটে গেছে। অদিতি এখন পাশের ঘরে ছেলেমেয়েদের সাথে শোয়।
শুধু মাত্র একটা গল্পের জন্যে। দীর্ঘ সাত বছর পর এক সময়ের সাড়া জাগানো গল্পকার অতীন সেন আবার লেখায় হাত দিয়েছে।
এই লেখার মধ্যে দিয়েই ঘটবে তার পুনর্জন্ম। সেদিনের সম্পাদক, সমালোচকদের উদাসীনতা, বিদ্রুপ আর বন্ধুবান্ধবদের 'অতীনটা গেঁজিয়ে গেছে, ওর দ্বারা আর কিস্সু হবে না' --- জাতীয় পণ্ডিতিকে একটা গল্পের মধ্য দিয়ে উচিত জবাব দিতেই হবে। আরসুনির্মলকেও বুঝিয়ে দিতে হবে অতীন সেন এখনো মরে যায় নি।
বিছানা ছেড়ে পায়ে পায়ে খোলা জানলায় দাঁড়ায় অতীন। বাইরে উন্মুক্ত আকাশ, হালকা মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছে চাঁদ। অতীনের মনে ভিড় করে অতীতের স্মৃতি।
তার গল্প তখন ছাপা হচ্ছে নানা পত্র - পত্রিকায় সেবার পূজোয় সব মিলিয়ে দশটা গল্প ছাপা হল কলকাতা আর মফস্বলের কাগজে। তার মধ্যে সাতটা গল্প নিয়ে প্রচুর লেখালিখি হল। আসতে লাগল চিঠি। এক সময়ে যে সব পত্রিকায় লেখা ছিল স্বপ্ন, আমন্ত্রণ জানালো তারাও। সে এক দাণ অনুভূতি।
লিখতে বসলেই কলমের ডগায় ফুটে উঠত নতুন শব্দ, নতুন ভাষা, আর নতুন নতুন কাহিনী। মাটির গন্ধ নিয়ে চরিত্ররা হাজির হোত। বক্তব্যের বলিষ্ঠতায়, গদ্যের শানিত ঋজুতায়, ডিটেলিংয়ে, ট্রিটমেন্টে, সর্বোপরি শিল্পের অপরূপ ব্যঞ্জনায় প্রতিটি গল্পেই চেনা যেত তার স্বতন্ত্রতা। অতি অল্প সময়েই তৈরি হয়ে গিয়েছিল নিজস্ব পাঠকগোষ্ঠী।
আসলে ছাত্র অবস্থা থেকে বিয়ের তিন বছর পরও সে সক্রিয়ভাবে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। ফলে সমাজ - জীবন ও মানুষের সঙ্গে তার ছিল নিবিড় ঘনিষ্ঠতা। অর্থনীতিরর সঙ্গে পরিবেশ পরিস্থিতির অন্তর্নিহিত সম্পর্ক বিষয়ে সে ছিল যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। সেই চেতনা ও অভিজ্ঞতার সার্থক প্রতিফলন ঘটেছিল লেখায়।
অথচ ভীষণ বিপর্যয়ের মধ্যে চলছে সংসার। বরানগরের ভাড়া বাড়ি। একটাই ঘর। পাশাপাশি আরো পাঁচ ঘর ভাড়াটে। এককথায় অসুস্থ পরিবেশ।
তারই মধ্যে ঘরে দুটো গ্ন শিশু। স্পি তিন বছরের, নিলয় মাত্র ন'মাসের , একটা না একটা লেগেই থাকে। ডাক্তার যেন ছাড়তেই চায় না। তার মধ্যেই বিভীষিকা হয়ে দেখা দিল অদিতির গলব্লাডারের সমস্যা।
মাঝে মধ্যেই ব্যথায় অসথির হয়ে পড়ত অদিতি। বেহুঁশের মতো পড়ে থাকত বিছানায়।

সংসারের যাবতীয় কাজ এসে পড়ত অতীনের ঘাড়ে। অনভ্যস্ত অতীন চোখে মুখে অন্ধকার দেখত।
অফিস কামাই করে দিনের পর দিন পড়ে থাকত বাড়িতে। স্টোভ ধরিয়ে রান্না, বাচচাদের খাওয়ানো, ঘরদোর পরিষ্কার করা, বাইরের কল থেকে বালতি ভরে জল টেনে আনা, জামাকাপড় কাচা--- দম ফেলার ফুরসৎ মিলত না।
তার মধ্যেই অদিতিকে ডাক্তার সোমের চেম্বারে দেখানো, এক্সরে-র ব্যবস্থা, প্রেসক্রিপশন মিলিয়ে ওষুধ কেনা এবং ফের ার পথে স্টেশনের কাছ থেকে দিনের কাঁচা বাজার করে আনা।
জানলা ছেড়ে চেয়ারে গা গলিয়ে বসে অতীন। পা দুটো তুলে দেয় টেবিলের ওপর। ড্রয়ার থেকে সিগারেট বের করে। সিগারেটের ধোঁয়ার সাথে চিন্তাগুলো হাওয়ায় ভাসতে থাকে।
রাত দশটার মধ্যেই শুয়ে পড়ত তারা। সাত বাই পাঁচ খাটের সঙ্গে একটা চওড়া বেঞ্চ জুড়ে শোওয়ার জায়গা বাড়ানো হয়েছিল। মশারিটা ছিল অর্ডার দিয়ে বানানো। তাতেও চার জন হাত পা মেলে ঘুমোতে পারতো না।
খাটের মাথার দিকে দেওয়ালে একটা তাক ছিল। লেখার খাতা কলম ওখানেই থাকত। ঘন্টা দুয়েক পর ঘুম ভেঙে যেত অতীনের। ততক্ষণে বাড়িঅলা ঘুমিয়ে পড়েছে। সমস্ত বাড়ি নিঝুম। খাট থেকে নেমে আলোটা জ্বালত। খাতা কলম নিয়ে আবার ঢুকে যেত মশারির ভেতর। ষাট পাওয়ারের বালবটা উলটো দিকের দেওয়ালে থাকায় ঠিকমতো আলো হত ন া। সাদা কাগজে ভেসে উঠতো মশারির সুতোর আবছা ছায়া। অতীনের লিখতে খুব অসুবিধা হত।
অথচ ষাট পাওয়ারকে একশ পাওয়ার করা ক্ষমতা ছিল না। বাড়তি টাকার টোপ দিয়েও বাড়িঅলাকে রাজি করানো যায় নি। কারণ এক বছর আগেই ওদের ওপর উঠে যাওয়ার নোটিশ পড়েছে। একনাগাড়ে তিন বছর পুরনো হলেই এ বাড়িতে ভাড়াটে উচ্ছেদের কলকাঠি নড়তে শু করে। উঠতে বসতে পেছনে লেগে ভাড়াটেকে অতিষ্ঠ করে তোলা হয়।
অতীন বাড়িঅলার এ হেন ফাঁদে ধরা দেয় নি। তাই তাকে তো খানিকটা বাড়তি দুর্ভোগ পোহাতেই হবে। তবে এ বা ড়িঅলার একটাই গুণ, কাজে ভাড়াটের জীবন জেরবার করে দিলেও কথার মিষ্টতা হারান না। গালমন্দ করা তো দূরের কথা।
সকাল সন্ধ্যে দোতলায় বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে থাকেন তিনি। শ্যেন দৃষ্টিতে সব লক্ষ রাখেন। কোন ঘরে বাচচা লে াহার গেটে ঝুলে দোল খেল বা টিউবকলের হাতল ধরে খট খটাং করল, কার ঘরে সন্ধ্যের আগেই লাইট জ্বলল -- বা ড়িঅলার চোখ থেকে পার পাবার জো নেই। ভাড়াটেরা তাই আড়ালে বাড়িঅলা ভূপেনবাবুকে 'শকুনবুড়ো' বলে ড াকত।
বর্ষাকালে এই শকুনবুড়োর চোখকেও ফাঁকি দিত অতীন। কারণ রান্নাঘরটা ছিল উঠোনের উলটো দিকে। বর্ষার সময় উঠোনটা জলের নিচে ডুবে যেত। বৃষ্টি আর নর্দমার জল মিলেমিশে একাকার। রান্না করা খাবার নিয়ে জল পেরিয়ে বড় ঘরে আসতে ঘেন্নায়পেটের ভাত উলটে আসত অদিতির। বাধ্য হয়েই একটা ছোট স্টোভ কিনতে রাতের অন্ধকারে শোওয়ার ঘরে ঢুকিয়েছিল অতীন। একটু রাত করে রান্না চাপাতো অদিতি। খাওয়া দাওয়ার পর অতীন এঁটো ব াসনগুলো লুকিয়ে রেখে আসত রান্নাঘরে।
অদিতি মাঝে মাঝে ভেঙে পড়তো। 'এভাবে বাঁচা যায় না। প্লিজ, তুমি ঘর দেখ। অন্তত দুটো ঘর। রান্নাঘর যেন লাগোয় া থাকে। আর ভূপেনবাবুর মতো ছোটলোক বাড়িঅলা যেন না হয়।'
অতীন স্ত্রীকে বোঝাতো। ব্যাঙ্কের একজন সাধারণ 'ক্লার্ক' হয়ে এ বাজারে খুব ভালভাবে থাকা যায় না। তার ওপর মাথ ায় বহু টাকার 'প্রভিডেন্ট ফাণ্ড লোন'। ছোট বোনের বিয়ের সময় নেওয়া। আরো এক বছর চলবে ডিডাকশান। লোন কাটা শেষ হলে ভাল বাড়ি দেখে উঠে যাওয়া যাবে।
অদিতি বুঝেও বুঝতে চাইত না। ফলে অহেতুক তর্কে জড়িয়ে পড়ত দু'জনে। চলত অভিযোগ, পালটা অভিযোগের প ালা। কেউ হারতে চাইত না। তাই তর্কও থামত না।
অবস্থা চরমে উঠত ছেলেমেয়েরা কেউ অসুখ পড়লে। সব সময় অতীনের পক্ষে অফিস কামাই করা সম্ভব হত না। ডাক্ত ার দেখানো ওষুধ কে না, বাচচার শুশ্রূষা, তার ওপর সংসারের প্রাত্যহিক কাজ। সব দিক সামলে অদিতি মাথা ঠিক র াখতে পারত না। একটুতেই রেগে উঠত। আবোল তাবোল বকত।
আর অতীন? অফিস থেকে ফিরেই পোশাক পালটে লেগে যেত কাজে। অদিতিকে জোর করে বিশ্রাম নেওয়াতো। সারা

রাত অসুস্থ সন্তানের পাশে জেগে সকালে যথারীতি অফিস চলে যেত।
এত করেও তার লেখা বন্ধ হয়নি। বরং গভীর জীবনবোধ নিয়ে আজও বেঁচে আছে সে সময়কার গল্পগুলো।
সেই একই অতীন সেনকে এখন একটা গল্প লেখার জন্য নিজেকে নিংড়ে দিয়েও কেন ব্যর্থতার গ্লানি বয়ে বেড়াতে হয়? কেন অসহ্য দহনে অহর্নিশ জ্বলে পুড়ে যেতে হয়?
চিন্তাটা মাথায় আসতে অতীন এই প্রথম তার অতীত ও বর্তমানের অবস্থানগত পার্থক্যের একটা তুলনামুলক এই উল্লম্ফন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাবার চেষ্টা করেন
অতীন কি কোনো দিন ভাবতে পেরেছিল বরানগরের নরক পূরী ছেড়ে এত দ্রুত সল্টলেকের এই মনোরম ফ্লাটে উঠে আসবে? এই উল্লম্ফনটা সেই আরবোপন্যাসের আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ পাওয়ার সঙ্গে তুলনীয়।
কাগজে সরকারী বিজ্ঞাপন দেখে পাশের টেবিলের সৌমিত্র বসুর হুজুগে পড়ে 'অ্যাপ্ লিকেশনটা' পাঠিয়ে দিয়েছিল অতীন। সঙ্গে দু'হাজার টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট।
মাস ছয়েক পর চিঠি এল অফিসের ঠিকানায়। টাকা জমা দিয়ে ঘরের দখল নেওয়ার জন্য।
পরের ঘটনাগুলো ঘটল যেন অদৃশ্য কোনো যাদুকাঠির ছোঁয়ায়। ইউনিয়নের জগদীশদাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের কাছে। তারপর ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের বিশেষ সুপারিশ নিয়ে ছুটেছিল ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটের হেড অফিসে। সেখান থেকে আইনকানুনের গণ্ডি পেরিয়ে 'ফ্ল্যাট পারচেজ' লোনের টাকাটা মঞ্জুর হতে লাগল আরো চার মাস
অতীনের নতুন ঠিকানা হল বি বি / চৌত্রিশ / ছয়, সল্টলেক সিটি, কলকাতা ৭০০০৬৪।
শু হল নতুন জীবন। সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে। পরিবর্তনের অনিবার্য প্রভাব সর্বপ্রথম পড়ল অদিতির ওপর। দ্বিগুণ উৎসাহে ঘর গোছানোর কাজে মেতে উঠল অদিতি। ফ্ল্যাটের অন্যান্য বাসিন্দাদের দেখাদেখি কেনা শু হল একটার পর একটা আসবাবপত্র।ধীরে ধীরে জানলার রং মিলিয়ে পর্দা, বিছানার চাদর, ব্যালকনিতে ঝুলন্ত ফুলের টব ফ্যামিলি সাইজের ফ্রিজ, ফিলিপসের একটা টু-ইন- ওয়ান কেনা হল। স্পি নিলয়ের দাবিতে সুন্দর একটা অ্যাকুরিয়াম বসল ডাইনিং স্পেসে।
কোথা থেকে কিভাবে যে এত টাকার যোগাড় হল অতীন অদিতির একান্ত আলোচনায় তাতে মিশে থাকে বিস্ময়ের ঘোর। অথচ সবই ধার।
বছর তিনেকের মধ্যেই সম্পূর্ণ ভোল পালটে গেল অতীনের সংসারে। প্রক্রিয়াটা যদিও অতীনের নিজের মধ্যে দ্রুত ঘটল না। সল্ট লেকে উঠে আসার পরও সে সপ্তাহে অন্তত তিনটে দিন অফিস ছুটির পর রিক্রিয়েশন ক্লাবে আড্ডা মারত। সক্রিয় রাজনীতির পাট চুকিয়ে দিয়েছিল নিলয় হওয়ার পর। যদিও বামপন্থার প্রতি তার সমর্থনের জোরটা আগের মতোই অটুট ছিল।
ফ্ল্যাটের জায়গার অভাব ছিল না। ছিল না শকুনবুড়োর উৎপাত। অদিতির অসুখটাও যেন হঠাৎ সেরে গেল। তবু অতীনের ভেতর খাতা কলম নিয়ে বসার আগ্রহ দেখা গেল না। অদিতির বেশ কয়েক বার বলা সত্ত্বেও না। কেমন একটা আরামবোধ পেয়ে বসল তাকে। বরানগরে থাকতে যে লোক গড়ে দিনরাত মিলিয়ে ঘন্টা পাঁচ ছয়েক বেশি ঘুমোত না, সল্টলেকে তার ঘুম বেড়ে হল দৈনিক সাড়ে আট থেকে নয় ঘন্টা।
অতীনের চেহারায় একটা জেল্লার ভাব এল। ভুঁড়িটা বেঢপ বেঢপ বেড়ে গেল। রিক্রিয়েশন ক্লাবে তার হাজিরা কমে গিয়ে দাঁড়ালো সপ্তাহে শুধু মঙ্গলবার। তাও আধ ঘন্টাখানেক। এই সময়ে ইউনিয়ন সম্পর্কে তার মন্তব্যে বন্ধুরা অনেকেই অবাক হল।
সাড়ে তিন বছরের মাথায় সে অতি তুচ্ছ কারণে রিক্রিয়েশন ক্লাবের চাঁদা দিতে অস্বীকার করল।
চার বছরের মাথায় সে সারা ভারত ব্যাঙ্ক কর্মী ইউনিয়নের ডাকা এসপ্ল্যানেড ইস্টের সমাবেশে না যাবার জন্য অফিস কামাই করে বাড়ি বসে রইল।
এর কিছু দিন পরই ঘরের পুরনো সাদা - কালো টিভিটা পালটে একটা বি . পি. এল কালার টিভি নিয়ে এল। ফলে অফিফস ছুটির পরই বাড়িতে ফেরার তৎপরতা বেড়ে গেল তার।

সে হয়ে উঠল একজন নিয়মিত টেলিভিশন দর্শক। বাংলা হিন্দী সব কটা সিরিয়াল, সাড়ে সাতটা, সাড়ে নটার সংবাদ তার চাই - ই। এছাড়া শনি রবিবারের সিনেমা, বুধবারের চিত্রহার, শুত্রবারের 'ওয়ার্লড দি উইক' কোনোটাই তার ব াদ যেত না।

পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বমোট দু'বার সে গল্প লেখার তাগিদ অনুভব করেছিল। প্রথমবার হঠাৎ-ই নিজের খেয়ালে, দ্বিতীয়বারপাঁচশ টাকার বিনিময়ে একটা বাজারী পত্রিকার পূজা সংখ্যায় লেখার আমন্ত্রণ পেয়ে। দু বারই গল্প দাঁড় করাতে না পেরে মাঝ পথে ছেড়ে দিয়েছিল। অবশ্য তার জন্য কোনো দুঃখ - বোধ বা অনুশোচনা ছিল না।

কেননা তখন সে এক ভিন্ন মার্গের মানুষ। অফিস বাড়ি ছাড়া যার দ্বিতীয় কোনো জগৎ নেই। একদা রাজনৈতিক কর্মী অতীনের একন রাজনৈতিক আলোচনার প্রতি তীব্র অনীহা। 'যে যায় লঙ্কায়, সে হয় রাবণ' জাতীয় বাজার চলতি অশিক্ষিত মন্তব্য ইদানিং যেখানে সেখানে করে বসে সে । তার নতুন উপলব্ধি হল ভারতবর্ষের অধ্যাত্মবাদ ছাড়া আর সব মতবাদই অচল। ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন তার চোখে শ্রমিকদের ধান্দাবাজ বানাবার প্ল্যাটফরম।

তার এই নতুন আত্মোপলব্ধিই তাকে সহকর্মীদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিল। দু একজন সুযোগ - সন্ধানী ছাড়া অফিসে তার প্রকৃত কোনো বন্ধু রইল না।

পারিবারিক জীবনের আয়েশী স্বাচ্ছন্দ্যে অতীন সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিল তার সাহিত্যের উজ্জ্বল অতীত। ভুলে গিয়েছিল বরানগরের সেই কঠোর সংগ্রামময় দিনগুলি। ভুলে গিয়েছিল রতনবাবু রোডের বিখ্যাত রায় পরিবারের ছেলে সুনির্মলকে।

কিন্তু নেহাতই ঘটনাচক্রে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো তার জীবনে ঘটে গিয়েছিল প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। অদিতি অনেক দিন ধরেই বলছিল অফিস লাইব্রেরি থেকে বই এনে দেবার জন্য। বরানগরের ঐ দুঃস্বপ্নের দিনেও বই পড়ার অভ্যেসটা বজায় রেখেছিল অদিতি। ইদানিং ছেলেমেয়েরা স্কুলে চলে গেলে দুপুরের দিকটা খুব ফাঁকা লাগত। কিন্তু অতীন কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছিল বারবার। কারণ চাঁদা না দেওয়ার জন্য রিক্রিয়েশন ক্লাবের মেম্বারশিপ বাতিল হয়ে গিয়েছিল তার।

সেদিন এই বই নিয়ে অদিতির সঙ্গে বেশ এক চোট হয়ে যাওয়ার পর অফিসে গিয়ে সৌমিত্র বসুর ড্রয়ার থেকে ল াইব্রেরিরক্যাটালগটা বের করেছিল অতীন। বই বাছার জন্য পৃষ্ঠা ওলটাচ্ছিল।

লেখক তালিকার 'দন্ত স' এর নিচে একেবারে শেষ জায়গায় সুনির্মল রায় নামটা দেখে বেশ অবাক হয়েছিল অতীন। লেখকের নামের নিচে ছ'টা উপন্যাসের তালিকা। টিফিন আওয়ারে সৌমিত্র বসুর কার্ডটা নিয়ে অতীন ছুটে গিয়েছিল লাইব্রেরিতে। লাইব্রেরিয়ান অলক ঘোষকে বিশেষ অনুরোধ করে পাওয়া গিয়েছিল তিনটে বই। বাকি তিনটে ইস্যু হয়ে গেছে। একটা বইয়ের পেছনের মলাটের লেখকের ছবিটা চমকে উঠেছিল অতীন। অবিকল সেই মুখ, চশমার নিচে গাঢ় দুই চোখ। নাকটা বাঁ দিকে ঈষৎ বাঁকানো।

সুনির্মলের 'বিষাদ সিন্দু' উপন্যাসটা কার্ডে ইস্যু করিয়ে অদিতিকে পড়তে দিয়েছিল অতীন। অচেনা নাম দেখে অদিতি রেগে উঠেছিল। কোথাকার কোন উটকো লেখক। আসলে বরানগরে থাকলেও কোনো দিন তাদের বাড়ি আসেনি সুনির্মল। যা দেখা হতোসেই সাহিত্য আসরে। নতুবা শ্মশানের ধারে নরেশদার চায়ের দোকানে। অতীনের বাড়িঅলা ভূপেন রায় ছিল সুনির্মলদের আত্মীয়। কিন্তু লোকটার নীচতাকে সহ্য করতে পারত না সুনির্মল।

অতীন অনেক করে বলার পর বইটা পড়তে রাজি হয়েছিল অদিতি।

পরদিন বিকেলে অফিস থেকে ফেরার পর অতীনের জন্য অপেক্ষা করছিল অন্য চমক।

কলিং বেল বাজাতে দরজা খুলেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছিল অদিতি। 'জানো, বইটা হুবহু আমাদের জীবন নিয়ে লেখা। আমি হলফ করে বলতে পারি লেখক আমাদের পরিচিত। পড়ে মনে হচ্ছিল আবার যে বরানগরে ফিরে গেছি। আম াদের দুঃখের দিনগুলির কি নিখুঁত বর্ণনা! আর উপন্যাসের নায়কের সঙ্গে অদ্ভুত মিল তোমার....'

তক্ষুণি বইটা নিয়ে বসেছিল অতীন। যখন শেষ হল রাত একটা। অতীনের ভেতর তখন অন্য অনুভূতি। বিস্ময়, শ্রদ্ধার প াশাপাশি কি একটা হারাবার যন্ত্রণা তাকে অস্থির করে তোলে।

এক উদীয়মান লেখকের পারিবারিক বিপর্যয় আর তার নিরলস সাহিত্য সাধনার মর্মস্পর্শী কাহিনী উপন্যাসের উপজীব্য।

উপন্যাসের লেখক - নায়ক সুদর্শন যেন তার দিকে ছুঁড়ে দেয় এক রাশ উপহাস। যেন বলে, একটু উন্নত জীবন পেয়েই নিজের শ্রেণীকে ভুলে গেলেন অতীনবাবু! কোথায় গেল আপনার আপসহীন কলম? সমাজ ও মানুষের প্রতি আপনার আদর্শ...আপনার শপথ... ?

অতীনের দৈনন্দিন জীবন ছন্দে চিড় ধরে। এক প্রলয়ঙ্কর ঝড় বয়ে যায় তার মনোজগতের ওপর দিয়ে। একটা পরাজিত মানসিকতা তাকে সর্বদা তাড়া করে বেড়ায়।

মনে পড়ে এই সুনির্মলের গল্প শুনেই বরানগরের সাহিত্য আসরে একদিন কঠোর মন্তব্য করেছিল অতীন। সভায় উপস্থিত অনেকেই ঐ মন্ত্যব্যের জন্য সমালোচনা করেছিল তার।

কিন্তু সবাইকে অবাক করে হাসিমুখে সব মেনে নিয়েছিল সুনির্মল। প্রকাশ্যে বলেছিল অগ্রজ গল্পকারের মন্তব্য তাকে হতোদ্যম তো করেই নি, বরং ভবিষ্যতে ভাল লেখার প্রেরণা যুগিয়েছে।

ছেলেটির বিনয় দেখে সেদিন নিজেই লজ্জিত হয়েছিল অতীন। তাদের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গিয়েছিল তারপর থেকেই।

জমিদার পরিবারের সন্তান হয়েও অতি সাধারণ জীবন যাপন করত সুনির্মল। স্ত্রী আর একমাত্র মেয়েকে নিয়ে পৈত্রিক বাড়ি ছেড়ে ভাড়া থাকত গঙ্গার ধারে একটা ছোট্ট ঘরে। কর্পোরেশনে কাজ করত। ওর আলমারিতে বইয়ের সংগ্রহ দেখে অবাক হয়েছিল অতীন। যদিও সুনির্মলের লেখা তাকে সেভাবে টানত না। তখনো কি জানত যে সেই সুনির্মলই একদিন....

লাইব্রেরি থেকে সুনির্মলের বাকি উপন্যাসগুলিও বাড়ি এনে পড়ে ফেলল অতীন আর অদিতি। প্রত্যেকটিই সমীহ জাগানো লেখা। একজন লেখকের চোখ দিয়ে খুঁটিয়ে পড়েও তেমন দুর্বলতা ধরা পড়ল না অতীনের চোখে। বিষয় - বক্তব্য দুই-ই অসাধারণ। অবক্ষয়ের বিদ্ধে তীব্র কশাঘাতের পাশাপাশি মানবিকতার দরদী চালচিত্র।

অতীন আর থাকতে পারে নি। অফিস থেকে বেরিয়ে একদিন সোজা চলে গিয়েছিল বরানগর। সুনির্মলকে পেয়ে গিয়েছিল লেখার টেবিলে। একটুও পালটায় নি। শুধু বয়সের ছাপ পড়েছে দু-চোখের কোলে। মাথার চুল সামনের দিকটায় বেশ পাতলা হয়েছে। ঘরের দারিদ্র্য আরো প্রকটভাবে ধরা পড়েছিল অতীনের চোখে।

প্রকাশের তাগিদে তার সাম্প্রতিক উপন্যাসের লেখায় খুব ব্যস্ত ছিল সুনির্মল। তার মধ্যেই অতীনকে পেয়ে খুব খুশি হয়েছিল। যৌবনের প্রারম্ভে অতীন সেনের গল্প পড়েই যে তার লেখার প্রেরণা লাভ, একথা স্বীকার করতে সে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নি।

দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে অতীন ভাঙতে শু করেছিল। ভাঙনের দ্রুত ও অনিবার্য প্রভাবে অতীন নতুন করে খাতা কলম নিয়ে বসেছিল।

সুনির্মলকে সে কিছুতেই বিজয়ী হতে দেবে না। এই মুহূর্তে তার চাই একটা গল্প। যে গল্পে নিজের জাত চিনিয়ে দেবে অতীন সেন। তারপর ধীরে সুস্থে উপন্যাসে হাত দেওয়া।

আজ দশ দিন ধরে কঠিন প্রতিজ্ঞার ব্রতে নিজেকে নিয়োজিত করেও একটা গল্পের কাঠামো দাঁড় করানো গেল না। তবুও অতীনের স্থির বিশ্বাস, প্রতিভা কখনো মরে না। নিরলস শ্রম আর একাগ্রতার সমন্বয়ে তার বিচ্ছুরণ ঘটাতে পারে একজন প্রকৃত শিল্পীই।

কিন্তু অতীন কি জানে চলমান জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে শিল্পীর প্রতিভাও এক সময়ে স্থবির, বিকলাঙ্গ হয়ে যায়।

বোধহয় জানে না।

হাঙর